প্রত্নচিহ্ন -র পরবর্তী সংখ্যার জন্য লেখা পাঠান। লেখা পাঠানোর শেষ তারিখ ৩০শে অক্টোবর, ২০২০। লেখা পাঠানোর জন্য যোগাযোগ করুন 8942924234 এই নম্বরে। E-mail : ab.farque@gmail.com

অতীত খুঁড়ে ইতিহাস উদ্ধার

# প্রত্নচিহ্ন

PDF MAGAZINE

ব্যক্তিগত বিতরণের জন্য

লেখকের বক্তব্য নিজস্ব। এজন্য প্রত্নচিহ্ন কমিটি কোনভাবে দায়ী নয়।

দ্বিমাসিক ৪ পাতা

১ম বর্ষ - ৩ সংখ্যা ❑ ১৭ আশ্বিন, রবিবার, ১৪২৭ সন ❑ ৪ অক্টোবর, ২০২০


## বাংলা-বাঙালি-বাংলাদেশ একটি পর্যালোচনা

**ড. রাজর্ষি চক্রবর্ত্তী**, ইতিহাস বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

*(গত সংখ্যার পর)*

ইংরেজ শাসনাধীন বাংলায় ভারতের প্রথম নবজাগরণের সূচনা হয়। রাজা রামমোহন রায় ছিলেন এই নবজাগরণের অগ্রদূত। এরপর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশব চন্দ্র সেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামকৃষ্ণ পরমহংস, স্বামী বিবেকানন্দ, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর,



আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, আচার্য জগদীশচন্দ্র, মেঘনাদ সাহা এই নবজাগরণকে এগিয়ে নিয়ে যান। বাংলায় যেমন প্রথম ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠা হয় তেমনি ইংরেজ বিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূচনাও হয় বাংলা থেকে। বঙ্কিমচন্দ্র লিখলেন 'বন্দেমাতরম' গান। শেখালেন দেশকে মাতৃকা রূপে পূজা করার মহামন্ত্র। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর আঁকলেন ভারতমাতা চিত্র। ফাঁসির মঞ্চে জীবনের জয়গান গেয়ে গেলেন ক্ষুদিরাম মাষ্টারদা সূর্যসেন ও আরো কত বীর তরুণ। বুলেট বুকে নিয়ে স্বাধীনতার বেদীমূলে প্রাণ দিলেন মাতঙ্গিনী হাজরার মত কত মহিলা। নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোস হয়ে উঠলেন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বাঙালির আপোষহীন সংগ্রামের মূর্ত প্রতীক।

ইংরেজ শাসন-শোষণে সোনার বাংলা শ্মশানে পরিণত হল। '৭৬ ও '৫০ -এর মন্বন্তরে বাংলা ছাড়খার হয়ে গেল। ইংরেজ সরকার বাঙালির মেরুদণ্ড ভাঙার জন্য ১৯০৫ -এ বাংলাকে ভাগ করল। এর প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ ডাক দিলেন রাখীবন্ধন উৎসবের। বাংলার ঘরে ঘরে পালিত হল অরন্ধন। মহিলারা পাঠ করলেন বঙ্গলক্ষীর ব্রতকথা। বাঙালির প্রতিবাদে শেষ পর্যন্ত বঙ্গভঙ্গ রদ করতে হল ব্রিটিশ সরকারকে কিন্তু বাঙালির জাতীয়তাবাদের শক্তি প্রত্যক্ষ করে ব্রিটিশ সরকার Divide and Rule নীতি প্রয়োগ করল। ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে ব্রিটিশদের মদতে প্রতিষ্ঠিত হল মুসলিম লিগ, ঢাকা শহরে। ব্রিটিশ সরকার বাঙালি হিন্দু ও বাঙালি মুসলমানকে একে অন্যের বিরুদ্ধে লড়িয়ে দিতে চেষ্টা করল। এর ফলশ্রুতি ১৯৪৭ -এ স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাগ।

অনেক লড়াই সংগ্রাম করে অনেক অশ্রু রক্তের বিনিময়ে যে স্বাধীনতা এল তা ছিল জন্মসূত্রে খণ্ডিত ও বিভক্ত। বাঙালি মুসলমান যদি বা তাদের স্বপ্নের পাকিস্থান পেল, মুহম্মদ আলি জিন্না বল্লেন সমগ্র পাকিস্থানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু। পাকিস্থান রাষ্ট্র বাঙালির মুখের ভাষা বাংলা করে নিতে চাইল। অনেক অনুরোধ-উপরোধেও কোন ফল হল না। কায়েদ-ই-আজম সমস্ত কিছু না মঞ্জুর করে বললেন উর্দুই হবে পাকিস্থানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। ফুঁসে উঠল বাংলার তরুণ সমাজ। ১৯৫২ খ্রীস্টাব্দের ২১-এ ফেব্রুয়ারি ছাত্ররা নেমে এলো রাজপথে। ১৯৫২ খ্রীস্টাব্দের ২১-এ ফেব্রুয়ারি ছাত্রদের মিছিলে পুলিশ গুলি চালালে শহীদ হলেন সালাম, জব্বার, রফিক, বরকত - বাংলা ভাষার প্রথম শহীদ। ১৯৬৫ খ্রীস্টাব্দে আয়ুব খান অদ্ভুত নির্দেশ দেন। পূর্ব পাকিস্থানের মানুষ রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইতে পারবেন না, কারণ রবীন্দ্রনাথ হিন্দু কবি। কবিরাও আবার হিন্দু- মুসলমান হয়। সেই কবেই কবি অন্নদাশঙ্কর রায় লিখেছিলেন -

এরপর ৪ পৃষ্ঠায় ▸

## ত্রিপুরা - এক বর্ণময় ইতিহাসের হাতছানি

**সুব্রত বিশ্বাস**

*(গত সংখ্যার পর)*

পরবর্তী তিনদিন অর্থাৎ ৫ই জানুয়ারী থেকে ৭ই জানুয়ারী পর্যন্ত চলে সেমিনার পর্ব। তবে এরই মধ্যে আমরা জানতে পারি সামান্য দূরবর্তী একটি পাহাড় সম্পর্কে। তার নাকি অপরূপ শোভা। নাম জম্পুই পাহাড়। আর সঙ্গে সঙ্গেই মন অত্যন্ত উদ্গ্রীব হয়ে ওঠে সেখানে যাবার জন্য। বিষয়টি নিয়ে জীবনদার সঙ্গে আলোচনায় বসলে, প্রাথমিকভাবে তিনি বেশ নিমরাজি হন সেখানে যাবার বিষয়ে। তিনি বলেন — জায়গাটা ভালো তবে আদিবাসী অধ্যুষিত এবং অস্থির। শুনে মনটা বেশ খারাপ হয়ে যায়। তারপর স্থানীয় ত্রিপুরা সরকারের পর্যটন বিভাগে যোগাযোগ করলে সেখান থেকে জানানো হয় যে জম্পুই পাহাড় সম্পূর্ণ নিরাপদ। আদিবাসীরাও অত্যন্ত ভালো। এসেছে। তাদের সময় জ্ঞান মুগ্ধ করে দেবার মত। পরিচয় হল গাড়িটির চালক শ্রী বলরাম বণিকের সঙ্গে। অত্যন্ত নম্র ও বিনয়ী মানুষ তিনি। আমরা তিন জন, বলরাম বাবু ও গল্প ---- শুরু হল আমাদের জম্পুই যাত্রা।

কথা প্রসঙ্গে বলরাম বাবু জানালেন, জম্পুই যাবার দুটি পথ রয়েছে। একটি পথে একটু বেশী সময় লাগলেও সেই পথেই পরে 'ঊনকোটি' — একটি অসামান্য দর্শনীয় স্থান। আর অন্য পথটি তুলনামূলক স্বল্প রাস্তার, যেটি সরাসরি যায় জম্পুই পাহাড়ে। আমরা ঠিক করি ঊনকোটি দেখেই আমরা যাব জম্পুই। সেই মতো বলরাম বাবু ধরলেন কৈলাশহর এর রাস্তা। বেশ কিছুক্ষণ পর যখন কৈলাশহরে প্রবেশ করলাম তখন তিনি স্থানীয় একটি গেষ্ট



আর কাল বিলম্ব না করে, আমরা ত্রিপুরা পর্যটন বিভাগের অফিস থেকে জম্পুই যাবার গাড়ি ও একটি চার শয্যা বিশিষ্ট ঘরকে ঠিক করি। প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখা ভালো যে, জম্পুই পাহাড়টি ত্রিপুরা ও মিজোরাম বর্ডারে অবস্থিত। আর পাহাড়টির একদম চূড়ায় থাকার জন্য রয়েছে শুধুমাত্র একটি সরকারী আবাস। যাই হোক যাবার সকল পরিকল্পনা সেরে আমরা বেশ আনন্দমনেই বাড়ি ফিরে এলাম। ৮ তারিখ সকাল, পূর্ব নির্ধারিত সূচী অনুযায়ী আমরা সকাল ৮:৩০ এর মধ্যে তৈরী হয়ে বাইরে বেড়িয়ে দেখি ত্রিপুরা সরকারের পর্যটন বিভাগের গাড়িটি সময়ের বেশ কিছু আগেই চলে হাউসে দাঁড়ালেন। আর আমরাও চোখে মুখে জল দিয়ে নিলাম। সেখান থেকে আর মিনিট পনেরোর মধ্যে পৌছলাম ঊনকোটি। জনশ্রুতি অনুযায়ী এখানে এক কোটি থেকে একটি কম দেবতার মূর্তি পাহাড় কেটে খোদাই করা রয়েছে। ইতিহাসবিদদের মতে ঊনকোটির অভিনব ভাস্কর্যটি তৈরী হয়েছিল অষ্টম বা নবম শতাব্দীতে। পাহাড়ের গায়ে খোদাই করা উল্লেখ্য মূর্তিগুলি হল — জটাধারী শিব ও ৩০ ফুট উঁচু কাল ভৈরবের মূর্তি। এছাড়াও রাম, বিষ্ণু, হনুমান ও রাবণের মূর্তি উল্লেখযোগ্য প্রতিবছর মার্চ / এপ্রিল মাসে এখানে আরম্বড়তার সঙ্গে অশোকাষ্টমি মেলা অনুষ্ঠিত হয়। যাই হোক এখানে প্রায়

এরপর ২ পৃষ্ঠায় ▸

## সম্পাদকীয়

প্রত্নচিহ্ন ম্যাগাজিনের এবার তৃতীয় সংখ্যা। এই ক-মাসে আশা করি আপনাদের কিছুটা কাছের হয়ে উঠতে পেরেছে আমাদের ম্যাগাজিন। আমরা সবসময় চেষ্টায় থাকি নতুন কিছু তথ্য আপনাদের সামনে তুলে ধরতে। আজ বাংলায় দুর্গাপুজোর ইতিহাস নিয়ে সংক্ষেপে কিছু কথা আলোচনা করব। আর কয়েকদিন পর বাঙালীর প্রাণের উৎসব দুর্গোৎসবের সূচনা হবে। কিন্তু কবে প্রথম বাংলায় এই পুজো শুরু হয়েছিল দেখতে গেলে জানা যায় ১৫০০ শতকের শেষ দিকে এই উৎসবের সূচনা হয়। তবে কে প্রথম দুর্গাপুজো করেন তা নিয়ে বহুমত প্রচলিত। এক জায়গায় বলা হচ্ছে দিনাজপুর-মালদার জমিদারের হাত ধরে পুজোর শুরু। আবার অপর তথ্য বলছে তাহেরপুরের রাজা কংশনারায়ণ বা নদীয়ার ভবানন্দ মজুমদার প্রথম শারদোৎসব সংগঠিত করেন। অন্য আরেকটি মত হল কলকাতার বরিশার সাবর্ণ রায়চৌধুরী পরিবারের হাত ধরেই বাংলায় শারদোৎসবের সূচনা। ১৭৫৭ -র পলাশীর যুদ্ধে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর জয়লাভের আনন্দে শোভাবাজার রাজবাড়ীতে দুর্গাপুজো শুরু হয়। আবার পরবর্তীকালে ব্রিটিশ রাজের বিরোধিতা করে দুর্গা ও ভারতমাতাকে এক করে দেখে স্বাধীনতার প্রতীক হিসাবে বঙ্গদেশে দুর্গাপুজো বৃদ্ধি পায় বারোয়ারী উৎসবের মাধ্যমে। কলকাতায় বাগবাজার সার্বজনীনের হাত ধরে তা সারা বাংলায় প্রচুর প্রচার লাভ করে ও ছড়িয়ে পড়ে। এই হল অতি সংক্ষেপে বঙ্গদেশে দুর্গোৎসবের উৎপত্তির কাহিনী। আশা করি উৎসবের আনন্দের মাঝে আমাদের প্রত্নচিহ্ন ম্যাগাজিনে আপনাদের আরও কাছের হয়ে উঠতে সক্ষম হবে। আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে আপনাদের ইতিহাস আগ্রহী করে তোলার ক্ষেত্রে। পুজোয় আনন্দ করুন, করোনা আবহে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখুন আর ইতিহাসকে ভালোবাসতে থাকুন।

▶ ১ পৃষ্ঠার পর

## এক বর্ণময় ইতিহাসের হাতছানি

ঘন্টাখানেক সময় কাটিয়ে আবার বেড়িয়ে পড়লাম জম্পুই পাহাড়ের উদ্দেশ্য। কিছুক্ষণ যাবার পর রাস্তার ধারে ছোট্ট একটি চা -এর ঘুমটি দেখে নামলাম আমরা। দোকানটির মালিক এক আদিবাসী পুরুষ ও পার্শ্বেই তার স্ত্রী প্রাচীন পদ্ধতিতে সুতো থেকে কাপড় তৈরীতে ব্যস্ত। চিনি ছাড়া চা -এর কথা বলায়, কিছুক্ষণের মধ্যেই চলে এলে চার কাপ চা। সে এক অদ্ভুত পাহাড়ী আমেজ। তবে তার থেকেও বেশী অবাক করার বিষয় হল চা এ চিনি না দেওয়ার দোকান মালিকের চা -এর দাম নিতে অস্বীকার করা — আর এখানেই আমরা খুঁজে পেলাম অনাবিল আদিবাসী সারল্যকে। যাইহোক একপ্রকার জোর করেই তার চা মূল্য প্রদান করে আমরা বেড়িয়ে পড়লাম আমাদের গন্তব্যের উদ্দেশ্যে।

বলরামবাবু বললেন যে জম্পুই পাহাড় থেকে সূর্যাস্ত ও সূর্যোদয় নাকি অদ্ভুদ দেখায়। ইতিমধ্যে বিকেল ৪:১৫ নাগাদ আমরা পৌঁছলাম জম্পুই পাহাড়ে। সরকারী আবাসের প্রাথমিক কাজকর্ম সেরে, ব্যাগপত্র ঘরে রেখে আমরা চললাম পার্শ্বের ছাদে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সূর্যাস্ত। পাহাড়ী বাঁশ গাছের মধ্যে দিয়ে সূর্যাস্ত — সত্যিই সে এক নয়নাভিরাম দৃশ্য। যেন সার্থক হল দুটি চোখ। এভাবেই ঘনিয়ে এল সন্ধ্যা। সরকারী নিবাস সংলগ্ন সাংস্কৃতিক মঞ্চের পাশে বসে শুরু হল গল্প। সেখানে বেশ কিছুক্ষণ সময় কাটিয়ে আমরা ঘরে চলে এলাম। এরপর রাতের খাবার ৯:৩০ নাগাদ খেয়ে আমরা শুতে চলে গেলাম। কারণ খুব ভোরে উঠতে হবে সূর্যোদয় দেখতে। যথারীতি ভোর ৫ টায় বলরামবাবু দরজা নেড়ে তৈরী হতে বললেন। তাঁর সঙ্গে এবারে আমরা উঠলাম অন্য একটি ছাদে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখি মিজোরামের পাহাড় থেকে উঁকি দিল দিনের প্রথম পর্ব। এক অসাধারণ অনুভূতি। এবারে সূর্যোদয় পর্ব শেষে আমরা ঘরে ফিরে প্রাতরাশ সেরে, তৈরী হয়ে বেড়িয়ে পরলাম আগরতলার উদ্দেশ্যে। তবে ফেরার আগে বলরাম বাবুর সঙ্গে আমরা দেখলাম স্থানীয় আদিবাসীদের গ্রাম্য জীবনকে। অসামান্য সুখস্মৃতি নিয়ে যখন আমরা আগরতলা ফিরলাম তখন ঘড়িতে প্রায় বিকেল ৩:৩০। বলরাম বাবুর কথা মতো এবারে আমাদের গন্তব্য ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমা ব্রাহ্মণবেড়িয়া। সেখানে বিকেল ৪:৩০ -এ শুরু হল কুচকাওয়াজ পর্ব। ভারতীয় সেনাদের অসামান্য শৌর্যের সাক্ষী হতে পেরে ধন্য হয়েছিলাম সেদিন। এর পর সন্ধ্যেবেলায় আগরতলা ষ্টেশন থেকে পুনরায় কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস। আর এভাবেই শেষ হল ত্রিপুরা ভ্রমণের বর্ণময় অভিজ্ঞতার। *(শেষ)*

# ‘গোয়াস’ মুর্শিদাবাদের এক প্রাচীন জনপদ ঃ একটি পর্যালোচনা

*(গত সংখ্যার পর)*

ফারুক আব্দুল্লাহ

নবাবি আমলে সমগ্র গোয়াস জনপদটি রাজশাহী জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরবর্তী সময়ে বিশেষত ব্রিটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে মেদিনীপুর জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত হয়। এই জনপদটিতেও দুটি বিখ্যাত জমিদার বংশ ছিল একটি ভগীরথপুরের ভগীরথ শাহুর জমিদারী অপরটি ছিল ইসলামপুরের সেন বংশীয়দের জমিদারী। ভগীরথপুরের জমিদার বংশটি প্রায় সপ্তদশ শতকের। তবে ইসলামপুরের জমিদার বংশটি আরও পুরানো একটি প্রায় পঞ্চদশ শতকে গড়ে ওঠে। সেন বংশীয় জমিদাররা পরবর্তীতে নবাবদের কাছ থেকে ‘মজুমদার’ উপাধি লাভ করলে এই জমিদার বংশ ‘মজুমদার’ বংশ নামেই পরিচিত হয়। সমগ্র জনপদটিতে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে ইসলামপুরের মজুমদার বংশীয় জমিদারদের অবদান অনস্বীকার্য। এই বংশের অন্যতম সুপুরুষ গোপীমোহন মজুমদার এবং গোয়াস মুনসেফী আদালতের মুনসেফ শ্যামধন মুখোপাধ্যায়ের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় ১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দে গোয়াসে গড়ে ওঠে অ্যাংলো ভার্নাকুলার স্কুল। ১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দে স্কুলটি ভেঙে পড়লে ১৮৭৮ খ্রিষ্টাব্দে ইসলামপুর জমিদার বংশের রায় হরিকৃষ্ণ মজুমদার বাহাদুরের প্রচেষ্টায় ইসলামপুরে গড়ে ওঠে ইসলামপুর ইংলিশ স্কুল যা সমগ্র জনপদটিতে পাশ্চাত্য শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেয়।

কোম্পানি আমল থেকেই সমগ্র গোয়াস জনপদ এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে নীল চাষ শুরু হয়। তবে ব্যাপক ভাবে শুরু হয়েছিল উনবিংশ শতকের শেষের দিকে। মেদিনীপুরের জমিদার হৃষীকেশ লাহার কাছে এণ্ড্রু ইউল এণ্ড কোং নামক এক কোম্পানি গোয়াস পরগণার বিস্তীর্ণ অঞ্চল লিজ নেয় নীল চাষ করার জন্য। তৎকালীন সময়ে পদ্মার শাখানদী ভৈরব, গোমানী ও শিয়ালমারীর চরে নীল চাষ করা হত। নীল চাষ করা হত বলেই ভৈরব নদীর চর তৎকালীন সময়ে ‘সাহেবচর’ নামে পরিচিত হয়ে ওঠে। জনপদটির নানা জায়গাতে নীলকুঠি গড়ে উঠেছিল। এই অঞ্চলে নীল চাষ ও নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের বহু কামিনী আজও লোকমুখে শোনা যায়। কথিত রয়েছে যে, ডোমকলের বাতিতপুরের এক ব্রাহ্মণ দুপুর বেলায় ছাতা মাথায় নীলকুঠির পাশ দিয়ে হেঁটে আসছিলেন এমন সময় নীলকুঠির নীলকর উইলিয়াম স্টেইন ছাতা মাথায় ব্রাহ্মণকে দেখে ভীষণ রেগে গিয়ে কুড়ি ঘা বেত মারার নির্দেশ দেন। নীলকরদের এমন বহু অত্যাচারের সাক্ষী রয়েছে এই জনপদ।



পরবর্তী সময়ে সমগ্র বাংলা জুড়ে নীলকরদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু হয়ে গোয়াস জনপদের নীল চাষীরাও তাতে অংশ নিয়েছিল বলে শোনা যায়। কিন্তু এ সম্পর্কে তেমন কোন তথ্য পাওয়া যায়না।

কয়েকশো বছরের প্রাচিন এই গোয়াস বা কসবা গোয়াস জনপদটি উনবিংশ শতকের শেষ লগ্নে ধ্বংস হয়ে যায়। ধ্বংসের পেছনে বহু কারণ ছিল যেমন - নবাব মুর্শিদকুলির সময় বৃহৎ গোয়াস পরগণাটি ভেঙে তিনটে ভাগ করে দেওয়া হয় ফলে শহর গোয়াস তার গুরুত্ব অনেকটাই হারিয়ে ফেলে। পরবর্তী সময়ে ভগবানগোলা বন্দরটি ভেঙে পড়লে এই জনপদটি অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। মুসলিম শাসন বাংলায় প্রবর্তিত হলে এই এলাকার প্রচুর মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে ফলে গোয়াসের বৈষ্ণব ধর্ম তার পূর্ব গৌরব হারিয়ে ফেললে ধর্মকেন্দ্র হিসেবে গোয়াসের পূর্ব পরিচিতি ম্লান হয়ে পড়ে। গোয়াস পরগণার অন্তর্গত ইসলামপুর অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে একটি পৃথক পরগণা হিসেবে গড়ে ওঠে এবং ইসলামপুর ক্রমশ সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে থাকে এবং রেশম শিল্পকে কেন্দ্র করে ইসলামপুর একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য কেন্দ্রে পরিণত হয়, ফলে ইসলামপুরের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে শুরু করে, ইসলামপুরের গুরুত্ব যত বৃদ্ধি পায়, গোয়াস ততই গুরুত্বহীন হয়ে পড়তে থাকে। *(ক্রমশ)*

# কালনা মহকুমার সংস্কৃত চতুস্পাঠী ও সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত

**সোমনাথ ভট্টাচার্য্য**

প্রায় পাঁচ শতাব্দীর বেশি সময় ধরে কালনা মহকুমার বিভিন্ন গ্রামে সংস্কৃত পণ্ডিতরা সংস্কৃত শাস্ত্র, সংস্কৃত টীকা রচনা করে ও বহু টোল ও চতুস্পাঠী স্থাপন করে তাদের প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যকে সারা বিশ্বের দরবারে স্থাপন করেছেন। ১৮৩৬ খ্রীঃ উইলিয়াম অ্যাডামের রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে বর্ধমান জেলায় ১৯৫টি চতুস্পাঠী ছিল। তার মধ্যে কালনায় ছিল ৫৭টি চতুস্পাঠী। কালনায় ছিল বিশ্ববরেণ্য পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতীর চতুস্পাঠী। কালনার বড় কালিতলায় ছিল অক্ষয় ভট্টাচার্য্যের "অক্ষয় চতুস্পাঠী"। মহিষমর্দ্দিনী তলায় ছিল কালিপদ ভট্টাচার্য্যের "রানী চতুস্পাঠী", হেরম্বচরণ ভট্টাচার্যের বাড়িতে ছিল "শ্যামচাদ চতুস্পাঠী"। সেন পরিবারের "সেন চতুস্পাঠী" প্রতিষ্ঠিত হয় সেখানে স্মৃতিশাস্ত্র পড়াতেন দেবেন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থ। কালনার হাঁসপুকুর গ্রামে পণ্ডিত সীতানাথ তর্কবাগীশের ছিল "কালিদাস চতুস্পাঠী" সেখানে তিনি ও তাঁর পুত্র পণ্ডিত বাসুদেব বিদ্যারত্ন কাব্যতীর্থ "ন্যায় ও কলাপ ব্যাকরণ" পড়াতেন। বৈদ্যপুরের জমিদার নৃসিংহচরণ নন্দী বৈদ্যপুরে "জ্ঞান তরঙ্গিনী" চতুস্পাঠী স্থাপন করেন। এছাড়া বৈদ্যপুরে "রোহিনী চতুস্পাঠী", "রামনগর বাসুদেব চতুস্পাঠী", "বৈদ্যপুর স্মৃতি জ্যোতিষ বিদ্যামন্দির চতুস্পাঠী ছিল। কালনার বিদ্যানগর গ্রামের পণ্ডিত মহেশ্বর বিশারদের পুত্র বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায় আনুমানিক ১৪৪৫ খ্রীঃ "সার্বভৌম" উপাধি লাভ করে। তিনি সার্বভৌম নিরুক্ত রচনা করেন। তাঁর রচিত অনুবাদ খণ্ডের টীকা "তত্বচিন্তামণি" ও বেদান্ত শাস্ত্রের টীকা "বেদান্ত ব্যাকরণ" গ্রন্থ রচনা করেন। বাসুদেব সার্বভৌম মিথিলায় ভারত বিখ্যাত নৈয়ায়িক পণ্ডিত পক্ষধর মিশ্রের কাছ শিক্ষা গ্রহণ করেন। বাসুদেব সার্বভৌম উৎকলরাজ পুরুষোত্তমদেব ও প্রতাপ রুদ্ররে সভাপণ্ডিত হয়ে শ্রীক্ষেত্রেই বাস করতেন। বাসুদেব সার্বভৌমের পুত্র জলেশ্বর ছিলেন বিখ্যাত নৈয়ায়িক পণ্ডিত। তিনি পক্ষধর মিশ্রের রচনা "শব্দালোক" গ্রন্থের টীকা রচনা করেন।

শ্রী মহাপ্রভুর সমসাময়িক



প্রখ্যাত নৈয়ায়িক বুনো রামনাথ প্রসিদ্ধ রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত ছিলেন কালনার ধাত্রী গ্রামের অধিবাসী। ধাত্রী গ্রামের সংস্কৃত পণ্ডিত অভয়রাম তর্কভুষণ ছিলেন তাঁর পিতা। রামনাথ ১৭৭০ খ্রীঃ ন্যায়ের টীকা রচনা করে বিখ্যাত হন। বর্ধমান জেলার গৌরব রঘুনাথ শিরোমনি সম্ভবত ১৪৮০ খ্রীঃ "চিন্তামনি দীক্ষিত, প্রত্যক্ষ মনি দীক্ষিত প্রামন্যবাদ" আত্মতত্ব প্রভৃতি টীকা রচনা করে বিখ্যাত হন। পণ্ডিত ভরত মল্লিক কালনা থানার পিণ্ডিরা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ভুরশুটের ব্রাহ্মণ রাজা প্রতাপাদিত্য ভরত মল্লিকের পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে সভাসদ নিযুক্ত করেন। সম্ভবত ১৫৯৯ খ্রীঃ তিনি অমর কোষের টীকা "মুগ্ধ বোধনী" গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি ১৬৭৫ খ্রীঃ "বৈদ্যকুল পঞ্জিকা" গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে "চন্দ্রপ্রভা", "রত্নপ্রভা", "বৈদ্যকুলতত্ব", "দ্রুত বোধ ব্যাকরণ" পণ্ডিত মহলে সমাদৃত। কালনার পণ্ডিত অযোধ্যানাথ বিদ্যাবাগীশ ও পণ্ডিত কৃষ্ণরাম তর্কলঙ্কারের পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে মুর্শিদাবাদের রাজা রাজবল্লভ তাঁর রাজ্যসভায় আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কালনার 'ন' গ্রামের বৈদ্য নরসিংহ কবিরাজ সংস্কৃত কাব্য 'বাসবদত্তার' একটি টিকা রচনা করেছিলেন। রামরাম তর্কসিদ্ধান্ত, দুর্গাদাস ন্যায়রত্ন, তারিণীপ্রসাদ ন্যায়রত্ন নব্য ন্যায়ের চর্চা করে পাণ্ডিত্য লাভ করেছিলেন। মীরহাট গ্রামের পণ্ডিত শ্রীরাম ন্যায় বাগীশের পুত্র সিদ্ধেশ্বর স্মৃতিরত্ন ছিলেন বিখ্যাত স্মার্ত পণ্ডিত। শ্রী রামের ছাত্র তেহাটা গ্রামের তারিণীচরণ বিদ্যাবাগীশ ও ভবতারণ ভট্টাচার্য্য পাণ্ডিত্যে খ্যাতিলাভ করেছিলেন।

(ক্রমশ)

# বালুচরী শাড়ির জন্মবৃত্তান্ত

**আশুতোষ মিস্ত্রি**

"মাছে ভাতে বাঙালি,
অঙ্গে শাড়ী, হাতে রেশমি চুড়ী,
কপালে টিপ, চোখে কাজল তাতেই যেন নারীর রূপ বাহারী।"

বহুকাল থেকেই বাঙালি নারীদের প্রধান পরিধেয় বস্ত্র হলো শাড়ি। জন্মানোর পর থেকেই মেয়েদের শাড়ি পড়েই থাকতে হত। বাল্যকালে ছাপানো শাড়ি পড়তে পেত, আর বিয়ের পর শাঁখা, সিঁদুরের সাথে লাল পেড়ে শাড়ি পড়ার রীতি ছিল। এখনকার বঙ্গ নারীরা কুচি করে যেভাবে শাড়ি পড়ছেন, এই পদ্ধতিতে শাড়ি পড়া



খুব জোর ১০০ বছর আগে থেকে এসেছে। ঠাকুর বাড়ির স্টাইল থেকে এমনভাবে শাড়ি পড়ার চল এসেছে বলে জানা যায়। পুরনো আমলে বাঙালি নারীরা এভাবেই শাড়ি পড়তো না। সিধে সাদা আট পৌড়ে শাড়ি পড়া চল ছিল। গ্রাম বাংলায় এখনো ঠাকুরমা, মা ও কাকিমাদের আগের পদ্ধতিতে শাড়ি পড়তে দেখা যায়। হাল আমলেনারীদের শাড়ি পড়া একটা ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে। বিশেষ কোন পুজো, বিয়ে অথবা স্কুল কলেজের অনুষ্ঠানে কেবলমাত্র শাড়ি পড়তে দেখা যায়।

শাড়ি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে মুর্শিদাবাদ জেলার দুই বিখ্যাত শাড়ির কথা না বললেই নয়। তাহলো (১) ঢাকার মসলিন শাড়ি ও (২) বালুচরের (জিয়াগঞ্জ) বালুচরী শাড়ি। মুর্শিদাবাদ জেলার রেশম শিল্প ও তার খ্যাতি ছিল বিশ্বব্যাপী। মসলিন শাড়ি এতই পাতলা, স্বচ্ছ মোলায়েম ও রেশমী ছিল যে একটা ৬০ হাত দীর্ঘ মসলিন শাড়ি নারকেলের মালায়ের ভেতরে পুরে নিয়ে যাওয়ার কথা ইতিহাসে লেখা আছে। এই মসলিন শাড়ি একটা আংটির ভেতর দিয়ে পাস করা যেত বলে জানা যায়।

যাই হোক এবার আলোচনা করা যাক বালুচরী শাড়ি নিয়ে -

বালুচরী শাড়ি জন্মবৃত্তান্ত নিয়ে নানামত আছে প্রথম মতে জানা যায় মুর্শিদকুলি খাঁন ১৭০৪ খ্রিস্টাব্দে সুবে বাংলার রাজধানী ঢাকা থেকে মকসুদাবাদে স্থানান্তরিত করার পর তার বেগমদের জন্য শাড়ি তৈরীর হুকুম দেন বালুচরের তাঁত শিল্পীদের। তারা যে নতুন শাড়ি সৃষ্টি করেন তাই বালুচরী নামে খ্যাত হয়। নবাব মুর্শিদকুলি খানের উদ্যোগে সেখানে এই শিল্পের রমরমা দেখা দেয়। অন্যমতে অষ্টাদশী শতাব্দীর প্রথম ভাগে বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার আজিমগঞ্জ-জিয়াগঞ্জ অঞ্চলে গড়ে ওঠে বাণিজ্য কেন্দ্র। দূরদূরান্ত থেকে মারোয়ারী, গুজরাটী, পাঞ্জাবী, আর্মানী, ইহুদী, ইংরাজ, ফরাসী ও ওলন্দাজ বণিকরা বাণিজ্যের জন্য আসতে থাকেন এই অঞ্চলে। একটি মত অনুসারে সেই সময় গুজরাতী তাঁতীদেরও আগমন হয় এবং তারফলে ভাগীরথীর পুর্বপাড়ে বালুচরে গড়ে ওঠে বয়ন শিল্প।

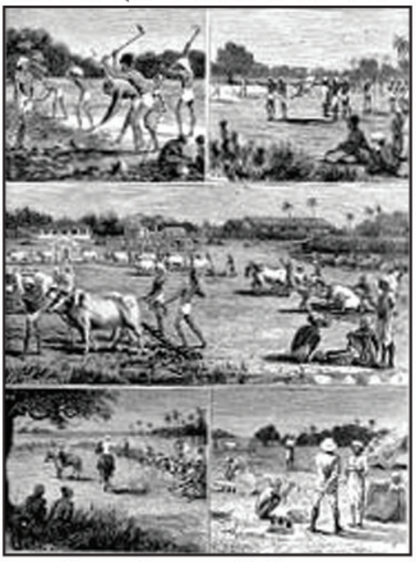
অষ্টাদশ শতকের শেষ থেকে তাঁতিদের অবস্থা আরো করুণ হয় ইংরেজে বণিকদের অত্যাচারে। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় বস্ত্র আমদানির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। উনিশ শতকের শুরুতে ঢাকা এবং মুর্শিদাবাদে বস্ত্র শিল্পের অবনতি শুরু হয়। ইংল্যাণ্ড থেকে কলে তৈরি সুতোর আমদানি শুরু হয় এবং ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ বাংলার বাজারে ছেয়ে যায়। ঢাকা ও মুর্শিদাবাদের চরকায় কাটা সুতোর শ্রমিকরা কাজ হারায়। বাংলায় বস্ত্র শিল্পে যখন অন্ধকার তখনই হঠাৎ এই মুর্শিদাবাদ জেলায় কিছু তাঁতির আবির্ভাব হয়। ভারত পথিক যদুনাথ সর্বাধিকারী তাঁর ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের চিত্র ভ্রমণ বৃত্তান্তে জিয়াগঞ্জ শহরে বালুচর বলে একটি অঞ্চলের কথা উল্লেখ করেছেন এক সময় চেলি ও গরদের আড়ত ছিল। মুর্শিদাবাদ জেলার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও রেশম শিল্প গবেষক নিত্য গোপাল মুখোপাধ্যায়ের মতে বহরমপুরের কয়েক মাইল উত্তরে ভাগীরথী তীরে অবস্থিত ছিল বালুচর। ঐতিহাসিক বিনয় ঘোষের মতে জিয়াগঞ্জের বালুচর ছিল রেশম শিল্প জাত নানাপ্রকার বস্ত্রাদির বড় আড়ত ও ব্যবসা কেন্দ্র। তাঁত শিল্পীদের বসতি ছিল জিয়াগঞ্জের নিকটবর্তী বাহাদুরপুর, বেলিয়াপুকুর, রামডহর, রমনাপাড়া, রণসাগর, আমডহর, বাগডহর, আমাইপাড়া প্রভৃতি গ্রাম সমূহ। তারা তাদের রেশম শাড়ি জিয়াগঞ্জের বালুচরে বিক্রি করতেন। বিক্রয় কেন্দ্রের নামেই শাড়ীর নাম হয় বালুচরী। (ক্রমশ)

# নীল চাষ ও নীল বিদ্রোহ ঃ বারাসাত

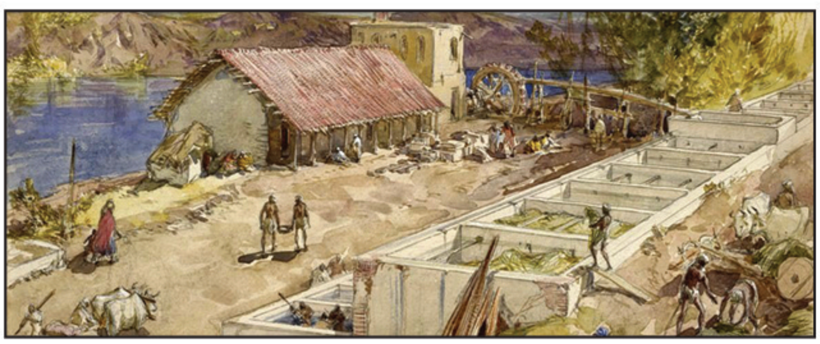
*(গত সংখ্যার পর)*

**সৌরভ বারুই**

নীল বিরোধী আন্দোলনের সবচেয়ে পুরনো নজীর পাওয়া যায় উইলিয়াম হিকি-র স্মৃতিকথা (১৭৭৭-১৮০৮) থেকে। হিকির বন্ধু ফ্রেডরিক মেটাল্যাণ্ড আর্নট ছিলেন কৃষ্ণনগরের নীলকর। অত্যাচারী হিসাবে তাঁর যথেষ্ট দুর্নাম ছিল। এমনকি তাঁর হাতে দু-জন নীল চাষীর মৃত্যু ঘটেছিল। স্মৃতি কথায় দেখা যায় আর্নট



দাদন দিয়ে চুক্তি অনুযায়ী নীল গাছের সরবরাহ না পেলে গ্রামে গিয়ে চাষীদের উপর আক্রমণ করেন। তখন কয়েক শত চাষী দলবদ্ধ হয়ে বাঁশ, লাঠি ইত্যাদি নিয়ে আর্নটের উপর আক্রমণ করে। তাকে ঘিরে ফেলে এবং লাঠির আঘাতে আর্নট কে হত্যা (১৮০৭) করে। আর্নট বিরোধী সংগ্রামে "কয়েক শত" চাষীর ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা দেখা গিয়েছিল। কিন্তু এই ঘটনার পর এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে বহু দিন পর। এরপর ১৮৩১ সালে বারাসাতের নারকেল বেড়িয়া (বর্তমান বসিরহাট জেলার অন্তর্ভুক্ত) গ্রামের কৃষকরা তিতুমিরের নেতৃত্বে বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করে নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন। ব্রিটিশ সরকার কামান দেগে বাঁশের কেল্লা ধ্বংস করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য বাঁশের কেল্লা আক্রমণের জন্য ব্রিটিশ সরকার বাংলায় প্রথম কামানের ব্যবহার করে। ১৮১০ সালের ১৩ই জুলাই লর্ড মিন্টো একটা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেন যে, বাংলায় বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত ইউরোপীয়রা যে সমস্ত অত্যাচার-অনাচার করছে তার প্রতি সরকারের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছে। এছাড়াও সেই বিজ্ঞপ্তিতে নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের কিছু নমুনার উল্লেখ করা হয়। এরপর ঐ বছর ২২ জুলাই বড়লাট আবার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে, আঞ্চলিক ম্যাজিস্ট্রেটদের কাছ থেকে অত্যাচারের রিপোর্ট চাওয়া হয়। কিন্তু বলা বাহুল্য বিজ্ঞপ্তি ও নির্দেশ জারির বিশেষ কোনো ফল হয়নি। কারণ, তখনকার দিনে নীলকর সাহেবদের অপরাধ প্রমাণ করা সহজ ছিল না। তাছাড়া সে সময়ে পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেট অনেক কম ছিল। গ্র্যান্ট নিজেই তাঁর রিপোর্টে বলেছিলেন যে, যদিও কয়েকজন নীলকর সাহেবের লাইসেন্স কেড়ে নেওয়া হয়েছিল, কয়েক জনের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলাও করা হয়েছিল, কিন্তু তাতে অত্যাচার খুব সামান্যই কমেছিল। বাংলার নীল চাষীদের অত্যাচার সম্পর্কে সমাচার দর্পণ-এ লেখা হয়েছে চাষীরা অনেক সময় নিজেদের জমি ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হত। যেখানে কৃষকদের সাহায্য প্রয়োজন সেখানে নীল চাষীদের আরও সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হয়েছিল। ১৮২৩ সালে ষষ্ঠ আইন দ্বারা (Regulation VI of 1823), নীলকর সাহেবরা যেসব চাষীদের টাকা বা নীল বীজ দাদন দিয়েছে তাদের জমির উপর বিশেষ স্বত্ব লাভ করে (a line and Interest in the land)। আগে নীলকর সাহেবরা জমি লিজ নিতে পারতেন না। কিন্তু ১৯২৪ সালে গভর্নর জেনারেল আমহার্স্ট শুধু জমি লিজ নেওয়ার অধিকারই দিলেন না, কৃষকরা আগাম নিয়ে জমি চাষ করছে না এই অভিযোগে মামলা করার অধিকার দিলেন। এরপর লর্ড উইলিয়ম বেন্টিক



নীলকর সাহেবদের আরও সুবিধা দিলেন। ১৮৩০ সালে পঞ্চম আইনের সাথে একটি নতুন ধারা যুক্ত হল। তাতে বলা হল আগামী দিনে কোনো কৃষক যদি নীল চাষ না করে তবে তার বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা করা যাবে এবং সেই অভিযোগ প্রমাণ হলে কৃষকের কারাদণ্ড হবে। বেন্টিক বিলেতের কোর্ট অফ ডিরেক্টরদের বুঝাচ্ছিলেন, যে নীল চাষ করতে সাহেবরা যত বেশি গ্রামে গ্রামগুলি তত সুসভ্য হবে এবং খৃষ্টান ধর্ম প্রচারের পক্ষে উপযুক্ত হবে। তাছাড়া ইউরোপীয় আচার আচরণ শিখে ইউরোপীয় ভোগ্য বস্তুগুলো কিনতে আগ্রহী হবে। মূল উদ্দেশ্য ছিল দুটি। মুনাফা অর্জন করা এবং অধিক সংখ্যক ইংরেজ আনিয়ে নিরাপত্তা বাড়ানো। ১৮৫৬ সালে নীলকর সাহেবদের অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিযুক্ত করা হয়। ফলে নীলকররা আরও আইনি অধিকার পেয়ে অধিকতর স্বৈরাচারী হয়ে উঠল।

নীলকর সাহেবরা যখন চাষীদের উপর অত্যাচার করছে তখন কলকাতার বুদ্ধিজীবী শিক্ষিত সমাজের কিছু মানুষের অভিব্যক্তি দেখলে অবাক হতে হয়। "সংবাদ-কৌমুদী" যখন লিখল, ইতিমধ্যে নীলকররা ধানের জমি দখল করে সেখানে নীল চাষ করছে এবং তার ফলে দেশে চালের উৎপাদন কমে যাচ্ছে জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে দেশে দুঃখ কষ্টও বেড়ে যাচ্ছে"। এর উত্তরে দ্বারকানাথ ঠাকুর ১৮২৮ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারি "সংবাদ-কৌমুদী" -তে চিঠি লিখে জানালেন, পূর্বে যেখানে চাষীদের জমিদারের জন্য বেগার খাটতে হত, সেখানে নীলকরদের কাছ থেকে ভালো টাকা পাওয়া যাচ্ছে। মাসে ৪ টাকা করে, যার ফলে তাঁর স্বাধীনভাবে আছে সুখে দিন কাটাচ্ছে। ...নীল চাষ বেড়ে গেলে নীল চাষীদের আরও উন্নতি হবে। ১৮২৯ সালে ১৫ই ডিসেম্বর একটি সভায় রামমোহন ও দ্বারকানাথ "ফ্রী ট্রেড" ও "কলোনাইজেশন" -এর সমর্থন করে বলেছিলেন, - "নীলচাষ বিহীন এলাকার কৃষকদের তুলনায়, নীলচাষ অঞ্চলের চাষীদের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভালো; কোনো কোনো ক্ষেত্রে চাষীরা কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হলেও মোটের উপর বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নীল চাষের দ্বারা কৃষকরা ও জনসাধারণ উপকৃত হয়েছে।

*(ক্রমশ)*

▶ ১ পৃষ্ঠার পর

# বাংলা-বাঙালি-বাংলাদেশ একটি পর্যালোচনা

"ভুল হয়ে গেছে বিলকুল
আর সব কিছু ভাগ হয়ে গেল
ভাগ হল না তো নজরুল"

সামরিক প্রশাসনকে কে বোঝাবে কবি কবিই - এটাই তার জাত, এটাই তার ধর্ম, বিশেষ করে তিনি যদি হন রবীন্দ্রনাথের মত বিশ্বকবি।

১৯৬৬ খ্রীস্টাব্দে শেখ মুজিব ঘোষণা করলেন ৬ দফা দাবি, অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্থানের জন্য সায়স্বশাসন। পশ্চিম পাকিস্থানের সামরিক কর্তারা শেখ মুজিবকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেপ্তার করে জেলে পুড়ল। ১৯৬৯ খ্রীস্টাব্দে পূর্ব পাকিস্থানে গণ-অভ্যুথান দেখা দেয়। শেষে ইয়াহিয়া খান সাধারণ নির্বাচন করবার প্রতিশ্রুতি দেয়। ১৯৭০ খ্রীস্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর সারা পাকিস্থানে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল। শেখ মুজিবের আওয়ামি লিগ পূর্ব পাকিস্থানের জন্য নির্ধারিত ১৬৯ টা আসনের মধ্যে ১৬৭টা তে জয়লাভ করে। অন্যদিকে জুলফিকার আলি ভুট্টোর পাকিস্থান পিপলস্ পার্টি পায় ৮৮টি আসন। এই প্রথম সমগ্র পাকিস্থানের শাসনভার বাঙালিদের হাতে চলে আসার পরিস্থিতি তৈরী হয়। এই বিষয়টি পশ্চিম পাকিস্থানের শাসককুল কোনভাবে মেনে নিতে পারল না। তারা পূর্ব পাকিস্থানের বাঙালির ওপর অকথ্য অত্যাচার শুরু করে। এই পরিস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার ৭ই মার্চের ভাষণ প্রদান করেন। ২৫-এ মার্চ রাত্রে পাকিস্থানী সেনাবাহিনী পূর্ব বাংলার মানুষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। গ্রেপ্তারের আগে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান বেতারে স্বাধীন বাংলাদেশের ঘোষণাপত্র পাঠ করেন। এরপর নয় মাস যুদ্ধ চলার পর ১৯৭১ খ্রীস্টাব্দে ডিসেম্বরে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়। বাঙালি ৩০ লক্ষ মানুষের জীবনের বিনিময়ে পেল স্বাধীন জাতিরাষ্ট্র যার রাষ্ট্রভাষা বাঙলা। পূর্ব পাকিস্থান হল স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র।

*(ক্রমশ)*

প্রধান সম্পাদিকা ও প্রকাশক - সহেলী চক্রবর্তী (৮৯৪২৯২৪২৩৪), প্রশ্নচিহ্ন হইতে প্রকাশিত।
উপদেষ্টামণ্ডলী - ড. অধ্যাপক রাজর্ষী চক্রবর্তী, ড. স্বপন ঠাকুর, সুবিদ আবদুল্লা, ফারুক আবদুল্লা। অক্ষর বিন্যাস - শুভ্রজ্যোতি তালুকদার (৯৭৩৪৩১৪৫৬৮)